বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ

তারেক রহমান

ও

বর্তমান প্রেক্ষাপট

রুহুল আমিন

Durbar
Publication

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ
তারেক রহমান
ও
বর্তমান প্রেক্ষাপট

প্রথম প্রকাশ ❐ জুন ২০২৫ ইং

প্রকাশক ❐ এস এম হুমায়ুন কবির পাটওয়ারী
চেয়ারম্যান, দুর্বার পাবলিকেশন্স

স্বত্ব ❐ শাহীন আখতার শিমুল

গ্লোবাল পার্টনার ❐ School of Leadership USA (SOLE)

অনলাইন পরিবেশক ❐ Durbarshop.com, Rokomari.com, Wafilife.com

প্রকাশনায় ❐ দুর্বার পাবলিকেশন্স
এন আলী টাওয়ার, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
✆ ০১৯৫৪-৬৯৩০৫৫

মূল্য ❐ ঃ ৪৯৯ টাকা, US$ 19.99

উৎসর্গ

শেখ হাসিনার সাড়ে পনের বছরের
স্বৈরাচারী শাসনামলে
গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের শিকার
সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ
ও
জুলাই-আগস্ট ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানে
নিহত ও আহত ভাই-বোনদের
করকমলে—

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ
উপক্রমণিকা

মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই যে অশেষ যাত্রাপথ, সেই অন্তহীন গতিপথের একটি পর্যায়ে মানব সমাজ "ফিউডালিজম" থেকে বেরিয়ে এসে একটি আধুনিক সভ্য সমাজের ভিত্তি স্থাপনের প্রয়াসে যে রাজনৈতিক তত্ত্বের অবতারণা করেছিল তাকেই দার্শনিকেরা অভিহিত করেছিলেন জাতীয়তাবাদের ধ্যান ধারণা হিসেবে। মৌলিক ঐক্য, স্বাধীনতা এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার যে মানবিক আবেদন তারই ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে উদ্ভব হয়েছে "জাতীয়তাবাদ"। তবে এ সত্যটিও হয়তো অস্বীকার করা যাবে না যে, "চরম জাতীয়তাবাদ" মানব সমাজে একই সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মারাত্মক দ্বন্দ্বেরও সৃষ্টি করেছিল। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এক পর্যায়ে সেই চরমপন্থী চিন্তাধারা একটা সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল যা থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এক অনবদ্য ভাবধারায় প্রবর্তন করেছিলেন যার নাম হলো "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ"। তবে এই বিশ্লেষণে বিস্তারিত যাবার আগে জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক ধারণাটির উদ্ভব, প্রসার এবং বিবর্তনের ইতিহাসটির একটি সংক্ষিপ্ত পর্যলোচনা হয়তো অবান্তর হবে না।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই জাতীয়তাবাদের ধারণাটি ক্রমশ: দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, তবে এর স্পষ্ট বহি:প্রকাশ হয় সত্যিকারভাবে ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে যখন "লিবার্টি, ইগালিটি ও ফ্র্যাটার্নিটি"র চেতনায় জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছিল রাজতন্ত্রের অবসানের ভেতর দিয়ে। একই সময়ে আমরা দেখেছি আমেরিকান জনগণও বিপ্লব করেছিল বৃটিশ ঔপনেবেশিকতার বিরুদ্ধে এবং একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আমেরিকার জনগণের অধিকারও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। পরবর্তীতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল। মূলত: শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে যার মাধ্যমে শ্রমজীবীদের অধিকারের প্রশ্নটি রাজনীতির মূলধারায় চলে

আসে এবং তারই ফলশ্রুতিতে সেখানে রাজতন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে নির্দিষ্টভাবে জার্মানী ও ইতালীর নাম উল্লেখ করার পাশাপাশি দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া ও ইকুয়েডরের নাম উল্লেখ না করলে জাতীয়তাবাদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে। এ পর্যায়ে যে কথাটি বলে জাতীয়তাবাদের এ পর্বের সমাপ্তি টানব সেটা স্পষ্ট না করলে জাতীয়তাবাদ পর্বের প্রতি অবিচার করা হবে। সেটি হচ্ছে বিলেতের "ম্যাগনা কার্টা"র ইতিহাস। যে ব্রিটেনকে ঔপনিবেশিকতার প্রতিভূ হিসেবে সারা বিশ্ব চিহ্নিত করেছিল সেই খোদ ব্রিটেনেও কিন্তু রাজতন্ত্রের বিপরীতে গণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১২১৫ সালে "ম্যাগনা কার্টা"র সরব উচ্চারণে রাজতন্ত্রের হাল টেনে ধরা হয়েছিল, যদিও সত্যিকার অর্থে "কনস্টিটিউশনাল মনার্কি" প্রতিষ্ঠা করতে পরবর্তী প্রায় শত হাজার বছরের সংগ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে বক্তব্য দিয়ে এই উপক্রমনিকার সূচনা করেছিলাম—মানব সমাজের সভ্য যুগের পদযাত্রায় জাতীয়তাবাদ ছিল মানুষের আকাঙ্খিত সেই দৃঢ় পদক্ষেপ।

।। দুই ।।

জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনায় "চরম জাতীয়তাবাদের" যে প্রসঙ্গটি আমি শুরুতে মুলতবী রেখেছিলাম এখন সে প্রসঙ্গে আসা যাক। কালের বিবর্তনে একদিন গণমানুষের অধিকার ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার রক্ষাকবচ হিসেবে যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল তা-ই পরবর্তীতে ক্রমশ: চরম রূপ ধারণ করতে শুরু করে। ফলশ্রুতিতে মানুষের মুক্তির আখ্যান যে জাতীয়তাবাদ, সেটাই আবার এক অতি শক্তিশালী রূপ ধারণ করে সমাজের সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ওপর আধিপত্যবাদের খড়গ হিসেবে আঘাতে লিপ্ত হয়। বিশেষ করে "কট্টর জাতীয়তাবাদের" কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী, সংখ্যালঘিষ্ঠ ও ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহের স্বকীয়তা, সামাজিক মূল্যবোধ ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ওপর হুমকি হয়ে দাঁড়াতে শুরু করে।

বিংশ শতাব্দীতে এসে জাতীয়তাবাদের ধারণাটি এক নতুন বিবর্তনে রূপ নেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে—একদিকে এশিয়াতে দেখেছি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ভারতবর্ষে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়েছে—যেমন ঘটিয়েছিল আফ্রিকার কেনিয়াতেও। কিন্তু তারই পাশাপাশি জাতীয়তাবাদ এক ভয়ংকর রূপ নিতে শুরু করে জার্মানীতে যার পরিণতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবতারণা

হয় এবং বিশ্বে এক ধ্বংসাত্মক অধ্যায়ের নতুন করে সূচনা হয় যার সঙ্গে এক পর্যায়ে জাপান, ইতালী ও ফ্রান্সের চরম জাতীয়তাবাদীরাও যুক্ত হয়েছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না পরবর্তীতে আফ্রিকার নাইজেরিয়াতে এবং অতিসম্প্রতি এশিয়ার ভারতেও চরম জাতীয়তাবাদের উদ্ভব স্পষ্ট লক্ষ্যনীয়। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে এক অত্যাচারী স্বৈরাচারী সরকারের উদ্ভব হতে দেখেছি যার প্রকৃত উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশ—যেখানে সাম্প্রতিকতম জাতীয়তাবাদের অজুহাতে কেবল সংখ্যালগিষ্ঠকেই দমন-নিপীড়ন করা হয়নি বরঞ্চ রাজনৈতিক ভিন্নমতকে চরম নির্যাতন, নিপীড়ন, এমনকি হত্যা, ধর্ষণ ও গুমের মাধ্যমে নির্বাসনে দিয়ে একদলীয় স্বৈরশাসন কায়েম করা হয়েছিল। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর ওপরে বলপূর্বক বাঙালী জাতীয়তাবাদ আরোপ করে তাদের মৌলিক সত্ত্বাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদ্যত হয়েছিল '৭৫ পূর্ববর্তী সরকার, যে মুহূর্তে জাতির নেতৃত্বে সিপাহী জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে অবতীর্ন হয়েছিলেন স্বাধীনতার ঘোষক বীর উত্তম জিয়াউর রহমান এবং "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের" ধারাটির অবতারণা করে বাংলাদেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে একই সূঁতোয় গ্রথিত করে ঐক্যবদ্ধ একটি জাতিতে নতুন যাত্রার সূচনা করে বিশ্বের বুকে একটি উদার গণতান্ত্রিক সম্মানশীল জাতি হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল যা হলো একটি ফুলের মালার সমারোহ যে মালার একেকটি ফুল হলো: বাঙালী, চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, ভীল, কোল, মুন্ডা প্রমুখ। আর তাদের সকলের সমন্বয়ে গঠিত সম্পূর্ণ মালাটি হলো "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ"। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের এর চেয়ে মহৎ ও চমকপ্রদ উদাহরণ আর কি হতে পারে?

।। তিন ।।

দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ফলে ঘাতকের বুলেটের আঘাতে ৩০ মে ১৯৮১ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টলার সার্কিট হাউজে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করার পর তার সহধর্মিনী বেগম খালেদা জিয়া শহীদ জিয়ার আদর্শকে সমুন্নত ও দিক দিগন্তে ছড়িয়ে দেবার জন্য শহীদ জিয়ার রক্তেভেজা দল বিএনপির হাল ধরেন। সুদীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় ধরে আপোষহীন সংগ্রাম করে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বিএনপিকে শক্ত ভিতের উপর দাড় করান এবং শহীদ জিয়ার আদর্শিক ঝান্ডাকে বিশ্ব দরবারে আসীন করেন। ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্বৈরাচার শেখ হাসিনার রোষানলে পড়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়েও তাকে কারাগারে যেতে হয় এবং সুদীর্ঘ ৬ বছর কারাবাস করে আদালতের রায়ে বেকসুর খালাস পান। তার

অনুপস্থিতিতে বিএনপির ঝান্ডা হাতে তুলে নেন শহীদ জিয়া ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুযোগ্য সন্তান জনাব তারেক রহমান।

সুদীর্ঘ সাড়ে পনের বছরের আপোষহীন সংগ্রামের ফসল জুলাই-আগস্ট'২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা। একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্রে। সে গণঅভ্যুত্থানে তারেক রহমান নেপথ্যের একজন কুশলীব ছিলেন যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে গণঅভ্যুত্থান ত্বরান্বিত হয় এবং স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে।

জনাব রুহুল আমিন সুদীর্ঘ গবেষণা করে "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, তারেক রহমান ও বর্তমান প্রেক্ষাপট" গ্রন্থে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্য, বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের **৩১** দফার লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্য এবং বর্তমান সরকারের রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারের যে লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্যে এর মধ্যে সমীকরণ করেছেন তাতে তার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা করার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রভাসিত হয়েছে। এ জন্য তিনি এবংবিধ বিষয়ে গবেষণাকারীদের মধ্যে অগ্রগামী হিসেবে অবশ্য বিবেচ্য।

ড. আবদুল মঈন খান

সদস্য, জাতীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
সাবেক মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সবিনয় নিবেদন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্রোতধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এটা সহজেই প্রতিভাত হয় যে, এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয়তাবাদী, সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী, মৌলবাদী ইত্যাদি ধারায় বিভক্ত। বাংলাদেশের বহত্তম দুটি রাজনৈতিক দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ (অধুনা প্রায়লুপ্ত) জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে আবার দ্বিধাবিভক্ত। একটি দলের দর্শন হল 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' ও অপর দলের দর্শন হলো 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'। সুদীর্ঘ প্রায় চার যুগ ধরে এ নিয়ে চলছে তুমুল বাকযুদ্ধ, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি। বাংলাদেশের জনগণ কি 'বাংলাদেশী' না 'বাঙালি' হিসেবে পরিচিত হবেন—এ প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করেই সব বিতর্ক ও জটিলতা।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে যারা বিশ্বাসী তাদের বক্তব্য হলো: "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হচ্ছে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রসীমায় বৃত্তবদ্ধ জনগোষ্ঠীর ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, স্থাপত্য, ঐতিহ্য, ইতিহাস, নিজস্ব জীবনবোধ, জীবনধারা, মনস্তাত্ত্বিক গড়ন, গঠন, ভাবধারা, আবেগ-আকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়ানুভূতির সমষ্টিগত বন্ধন।" পক্ষান্তরে বাঙালি জাতীয়তাবাদে যারা বিশ্বাস করেন তাদের বক্তব্য হলো: "বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল দর্শন হচ্ছে বাংলা ভাষা। এ ভাষার জন্যই আমাদের দামাল ছেলেরা বায়ান্নোতে জীবন দিয়েছে। বায়ান্নোর রক্তাক্ত পথ বেয়েই '৭১-এ বাংলাদেশ অর্জিত হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে—তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতার চেতনার পরিপন্থী এবং সামরিক চক্রান্তের ফলশ্রুতি।"

জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পন্ডিত ব্যক্তিদের তীব্র বাদানুবাদ, যুক্তি-পাল্টা যুক্তির প্রেক্ষিতে এ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা করার জন্য উৎসুক হই। সুদীর্ঘ দিন আমাদের অতীত ইতিহাস ও বিভিন্ন মনীষীদের গবেষণালব্ধ মূল্যায়ন পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' না 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' আমাদের জন্য

উপযোগী, সে সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে আমি আমার সীমিত জ্ঞান দিয়ে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশে বসবাসকারী মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান, গারো, খাসিয়া, চাকমা, মারমা, হাজং, লোসাই, সাওতাল সবাই বাংলাদেশী। আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এ দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বাংলাদশে বসবাসকারী বাঙালি-পাহাড়ী সবাই মিলে একটি অখন্ড জাতিসত্তা। এখানে সবাই আমরা একে অপরের ভাই। এখানে কোন জাতিভেদ নেই। আমরা হচ্ছি বাংলাদেশী জাতি। সুতরাং আমাদের জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশী হওয়াই বাঞ্চনীয়। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ বহুল বিতর্কিত এ ইস্যুটির সমাধানে এগিয়ে আসবেন বলে আমি আশাবাদী। কোন আবেগ নয়, ভাবাবেগ তাড়িত হয়ে নয়—যুক্তির কষ্টিপাথরের মাপকাঠিতে এ বিষয়টির সুরাহা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

‖ দুই ‖

মঈন-ফখরুদ্দীন গংদের সহায়তায় ২০০৮ সালের বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতার মসনদে বসে ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে সাড়ে পনের বছর জগদ্দল পাথরের ন্যায় ক্ষমতা আকড়ে ধরে থাকে। তাদের মূল বুলিই ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা। এই দুই চেতনাকে পুঁজি করে সুদীর্ঘ সাড়ে পনের বছরে তারা গুম, খুন, ধর্ষণ, লুটপাট, অকথ্য নির্যাতন, ব্যাংক ডাকাতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদ পাচার, বিদেশী একটি রাষ্ট্রের লেজুরবৃত্তি করা ও বিরোধী মত ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে দেয়ার মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত ছিল। সুদীর্ঘ সাড়ে পনের বছরে তারা বিএনপি ও জামায়েতে ইসলামীর দুই হাজারের বেশী নেতা-কর্মীকে গুম, খুন এবং তিন হাজারের বেশী নেতা কর্মীকে ক্রস-ফায়ারে হত্যা করে। একটি অলিগার্ক শ্রেণি সৃষ্টি করে কার্যত শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে একটি মাফিয়া রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

শেখ হাসিনা ও তার পেটোয়া বাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়নে বাংলাদেশ এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গের রূপ ধারণ করে। যার বহি:প্রকাশ ঘটে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে। সমগ্র বাংলাদেশ বারুদের মতো জ্বলে উঠে। দুই হাজার ছাত্র-জনতার আত্মাহুতি ও ত্রিশ হাজার ছাত্র-জনতা আহত হওয়ার প্রেক্ষিতে গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। আমাদের নতুন প্রজন্ম এবং দেশের সর্বস্তরের জনতা নতুন একটি বাংলাদেশ চায় যেখানে থাকবে না কোন বৈষম্য এবং জনগণ ভোটের মাধ্যমে সব সময় তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবেন—এমন একটা বন্দোবস্ত। সামাজের সর্বক্ষেত্রে

বৈষম্য দূরীকরণ ও নুতন বন্দোবস্ত করতে হবে। সরকার রাষ্ট্রকাঠামো মেরামত বা সংস্কারের জন্য প্রধান ৬ টি সহ মোট ১১ টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছেন।

যার মূল লক্ষ্য হলো- (১) একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন (যেখানে আওয়ামী লীগ ও তার দোসররা ছাড়া আর সব দল অংশগ্রহণ করবে); (২) এমন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে যাতে এক ব্যক্তির কাছে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয় অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য হয়; (৩) সংবিধানে এমন একটি গ্যারান্টি ক্লজ থাকতে হবে যাতে ৫ বছর পর পর অন্তবর্তীকালীন/তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় এবং উক্ত বিধান আদালত বা সংসদ পরিবর্তন করতে পারবে না; (৪) দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট অর্থাৎ এমেরিকার মতো আপার হাউজ ও লয়ার হাউজ; (৫) কোন ব্যক্তি ২ বারের বেশী প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি দলের প্রধান থাকতে পারবেন না; (৬) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইনের শাসন কায়েম করতে হবে; (৭) স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ও স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করতে হবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিতে হবে যাতে তারা নিরপেক্ষভাবে/স্বাধীনভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে; (৮) দেশ থেকে যে টাকা পাচার হয়েছে তা ফিরিয়ে আনতে হবে এবং দুর্নীতিবাজ, লুটেরাদের বিচার করতে হবে; (৯) সর্বোপরি জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে নিহত, আহত সহ গত ১৫ বছরের গুম খুনের সাথে যারা জড়িত তাদের বিচার করতে হবে; (১০) দ্রব্যমূল্যের লাগাম টেনে ধরতে হবে এবং দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট মুক্ত দেশ গড়তে হবে; (১১) জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে নিহত-আহতের ক্ষতিপূরণ/পুনর্বাসন করতে হবে। ছাত্র-জনতার প্রতিটি চাওয়া-পাওয়া বা প্রত্যাশার সাথে আমি একমত। আর এগুলি বাস্তবায়ন সম্ভব হলেই আমারা এক সঙ্গে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের মানুষে ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারবো। এদেশে শেখ হাসিনার মতো আর কোন দানব সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্যই ছিল: (১) মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা সংরক্ষণ; (২) টেকসই/সবল গণতন্ত্র; (৩) আইনের শাসন; (৪) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা; (৫) বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা; (৬) প্রত্যেকটি নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা; (৭) সমতা, নিরপেক্ষতা ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে শোষণমুক্ত সমাজ যাতে থাকবে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা; (৮) আর্থিক খাতকে শক্তিশালী করে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলা। বর্তমান সরকারের রাষ্ট্র কাঠামো মেরামত বা বিএনপির রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে: (১) টেকসই/সবল গণতন্ত্র; (২) দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ;

(৩) বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা (যা গত পনের বছর ছিল না); (৪) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা; (৫) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা; (৬) দল নিরপেক্ষ প্রশাসন; (৭) প্রতিটি নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা; (৮) দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করা; (৯) সর্বস্তরে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা; (১০) দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখা; (১১) রাষ্ট্র ও নাগরিকের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান; (১২) আর্থিক খাতকে শক্তিশালী করা (এবং পাচারকৃত টাকা ফেরৎ আনা) ইত্যাদি।

সুতরাং এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য ও আদর্শ এবং বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ও আদর্শের মধ্যে যোজন যোজন দূরত্ব বিদ্যমান নেই বরঞ্চ উভয়ের লক্ষ্য ও আদর্শের মধ্যে সাযুজ্য রয়েছে। সুদীর্ঘ ৪৭ বছর পূর্বে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছেন বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার দেশ ও জনগণ নিয়ে প্রায় একই রকম স্বপ্ন দেখেন। আমাদের প্রত্যাশা তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হউক। স্বার্থক হউক। বাংলাদেশী হিসেবে আমরা বিশ্চের বুকে মাথা উঁচু করে দাড়াবো সগর্বে।

এ গ্রন্থটি পড়ে কেউ যদি আমাদের জাতীয়তাবাদ ও দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আরো গভীরভাবে জানার সামান্যতম আগ্রহও প্রকাশ করেন তবেই আমার শ্রম স্বার্থক হবে। এ প্রন্থটি লেখার ক্ষেত্রে যে সমস্ত গবেষকদের মূল্যবান গবেষণা রেফারেন্স হিসেবে নেয়া হয়েছে তাদের ঋণ স্বীকার করছি কেবল, পরিশোধ করার দৃষ্টতা কল্পনায় আসে না। এ গ্রন্থটির উপক্রমণিকা লিখে বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাবেক মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান স্যার আমাকে ধন্য করেছেন। বইটি প্রকাশে আমার সহধর্মীনি শাহীন আখতার শিমুল, আমার পুত্রদ্বয় আজমাইন আমীন ও শাফকাত আমীন, পুত্রবধু নাইমা সুলতানা রশিদ, বন্ধুবর এস এম হুমায়ুন কবির পাটওয়ারী, নূরুজ্জামান ভাই, শ্রদ্ধেয় শিমুল ভাই, নান্নু ভাই, মাহবুব ভাই সহ যারা উৎসাহ-অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদেরকে খাটো করতে চাই না। আগামী দিনে তাদের মতো অসংখ্য শুভাকাংখীদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতাই আমার চলার একমাত্র পাথেয়।
খোদা হাফেজ

রুহুল আমিন

প্রকাশকের কথা

একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধিন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সরকারের ৪৪ মাসের শাসনামলে সীমাহীন দুর্নীতি, লুটপাটের ফলে ৭৪ এর দূর্ভিক্ষ, ব্যাংক লুট, দেশের সম্পদ ভারতে পাচার, রক্ষীবাহিনী ও যুবলীগের সন্ত্রাসে জাতি যখন দিশেহারা ঠিক সেইসময়ে মুক্তির দূত হিসেবে বাংলাদেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের রূপকার, সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জিয়াউর রহমান বীর উত্তম। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে জিয়াউর রহমান সংবিধানে বিসমিল্লাহ ও আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস সংযোজন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সাম্য ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, সবার সাথে বন্ধুত্বের মাধ্যমে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, আরাফাতের ময়দানে নিমগাছ লাগানোসহ ওআইসির মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, সার্ক গঠন, দেশ গঠনে ১৯ দফা প্রণয়ন, দূর্ভিক্ষ দূরীকরণে খাদ্যে স্বাবলম্বী হওয়া, বেকারত্ব দূরীকরণে বিদেশে শ্রম রপ্তানি শুরু করেন যারফলে ২ কোটি রেমিটেন্স যোদ্ধা সৃষ্টি হয়েছে। এসব কার্যক্রম ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি উন্নত ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক তা অনেকেই পছন্দ করেননি। ফলে দেশী-বিদেশী চক্রান্তের মাধ্যমে ৩০ মে, ১৯৮১ ঘাতকের গুলিতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। জাতি হারালো একজন রনাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধা, বহির্বিশ্বে সুপরিচিত, সৎ, দেশপ্রেমিক ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ককে।

সৈরশাসক এরশাদের ৯ বছর, সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফখরুদ্দীন -মঈন উদ্দিনের ২ বছর ও স্বৈরাচারী-ফ্যাসিষ্ট হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সরকারের ২১ বছর সাকুল্যে ৩২ বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার ও হাজার কোটি টাকা খরচ করে বিএনপির বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালানো হয়। তারা শহীদ জিয়ার রক্তেভেজা দল বিএনপিকে নি:শেষ করে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। দল গোছাতে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন জনাব তারেক রহমান। ২০০১-২০০৬ সালে তৃণমূল

সম্মেলনসহ অসংখ্য অনন্য কর্মসূচির মাধ্যমে দলকে শক্তিশালী করেন। তিনি হয়ে উঠেন দেশনায়ক এবং রাজনীতির দার্শনিক। তার মাঝে পরিলক্ষিত হয় জিয়াউর রহমানের প্রতিচ্ছবি। ফলে আবারো শুরু হয় ষড়ষন্ত্র। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির শত্রু, ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী শক্তি, বাংলাদেশী জাতিয়তাবাদ বিরোধী শক্তি, ভারত ও তাদের দালালরা গোয়েবলসীয় কায়দায় তারেক রহমানের বিরুদ্ধে অসহনীয় অপপ্রচার শুরু করেন। ষড়যন্ত্রকারীরা মনে করেন, বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে হলে ইসলামী মূল্যবোধ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ রুখতে হবে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ রুখতে হলে জিয়া পরিবারকে ধ্বংস করতে হবে! আর জিয়া পরিবারকে ধ্বংস করতে হলে তারেক জিয়াকে শেষ করতে হবে! এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ষড়ষন্ত্রের মাধ্যমে ১১ জানুয়ারী ২০০৭ রাষ্ট্র পরিচালনায় আসেন জেনারেল মঈন উদ্দিন ও ফখরুদ্দীন আহমদ এবং ২০০৯ তে ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় পাতানো নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় বসানো হয়। তারপর জিয়া পরিবার ও বিএনপির বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ পরিচালনা করেন। মিথ্যা মামলায় তারেক রহমানকে গ্রেফতার করে এবং অমানুষিক নির্যাতন ও হত্যা চেষ্টা চালায়। আল্লাহর অশেষ রহমত ও কোটি কোটি মানুষের ভালোবাসা-দোয়ায় তিনি প্রাণে বেঁচে আছেন এবং দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। শেখ হাসিনার জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য জিয়া পরিবার ও বিএনপি'র উপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালান। বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের ৭০০ গুম, ৩০০০ খুন, ৬০ লক্ষ নেতা-কর্মীর নামে ৫০ হাজার ভূয়া মামলা দেয়া হয়। অন্যায়ভাবে বেগম খালেদা জিয়াকে ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করাহয় এবং মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে জেলে রেখে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হয়।

স্বনামধন্য লেখক, গবেষক ও কলামিস্ট জনাব রহুল আমিন "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ তারেক রহমান ও বর্তমান প্রেক্ষাপট" গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আমাকে প্রস্তাব দিলে আমি সানন্দে গ্রহণ করি। কারণ জিয়া পরিবারের বিরুদ্ধে যুগযুগ ধরে চলা অপপ্রচারের বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দিতে হবে এবং ভারত-হাসিনার ষড়ষন্ত্র ও দেশ-বিরোধী কার্যকলাপ নতুন প্রজন্ম ও বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে। একজন ভক্ত হিসেবে আমি যদি শহীদ জিয়া, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বাংলাদেশের ভবিষৎ কর্ণধার জনাব তারেক রহমান এবং তাদের রাজনৈতিক দর্শনের উপর রচিত গ্রন্থাদি প্রকাশ করতে পারি তবেই নিজকে স্বার্থক মনে করবো।

এস এম হুমায়ূন কবির পাটওয়ারী

সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, কানাডা বিএনপি (প:)

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা	৪
সবিনয় নিবেদন	৮
প্রকাশকের কথা	১২
জাতীয়তাবাদ	১৫
বাঙালি জাতীয়তাবাদ	২৮
বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ	৩০
বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে মূল পার্থক্য	৩২
বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি	৪১
ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ	৬৭
বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও বর্তমান প্রেক্ষাপট	১০০
দ্বিতীয় স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার আশা আকাঙ্খা	১১৭
বিএনপি রাষ্ট্র সংস্কার নিয়ে কি ভাবছে?	১২০
উপসংহার	১৩৮

১৪ অক্টোবর, ১৯৭৭ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ঘোষণা করেন, আমরা এ দেশের মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, গারো, খাসিয়া, চাকমা, মারমা, হাজং, লোসাই, সাঁওতাল সবাই বাংলাদেশী। আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বাংলাদেশে বসবাসকারি বাঙালি-পাহাড়ি সবাই মিলে একটি অখন্ড জাতিসত্তা। এখানে সবাই আমরা একে অপরের ভাই। এখানে কোন জাতিভেদ নেই। আমরা হচ্ছি বাংলাদেশী জাতি। সুতরাং আমাদের জাতীয়তাবাদ হলো 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই আমাদেরকে 'জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে হবে।

জাতীয়তাবাদ

————————⌘————————

জাতীয়তাবাদ বলতে আমরা বুঝি একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রসীমায় বসবাসকারী ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, জনসত্তা নির্বিশেষে– একদল মানুষের আবেগ- আকাঙ্খা, আত্মোপলব্ধি, একাত্মবোধ, ঐক্যবোধ, সংহতিবোধ ইত্যাদি।

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে হেন্‌রি সেসিল উইন্ড তাঁর 'The Universal Dictionary of English Language'-এ জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যায় একে বলেছেন- 'sense of national unity' বা 'জাতীয় ঐক্যানুভূতি'। এটা অবশ্যই জাতীয়তাবাদের জন্য অপরিহার্য বটে; কিন্তু শুধু ঐ প্রকার অনুভূতিকে জাতীয়তাবাদ বলা চলে না; তা' জাতীয় ঐক্যের গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত হয় এবং আরো দশজনকে একই রকম কর্মে ও অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত করে।

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক অভিধানে বলা হয়েছে- "Nationalism denotes a form of group consciousness i. e. consciousness of membership in attachment to a nation. Such consciousness is often called consciousness of nationality and identifies the fortunes of group members with that of a nation- state desired of achieved." অর্থাৎ 'জাতীয়তাবাদ' হ'ল একটি জাতিগত দলবদ্ধ চেতনা,— যে জাতি- রাষ্ট্রভিত্তিক; ধর্ম, ভাষা কিংবা অঞ্চলভিত্তিক নয়। এ রকম জাতীয় রাষ্ট্রের আকাঙ্খিত ও উপার্জিত সৌভাগ্যের অংশীদার হিসেবে ঐ দল চেতনাই জাতীয় চেতনাকে সৃষ্টি করে এবং

জাতি নির্মাণে নিঃস্বার্থ শ্রমদানে উদ্বুদ্ধও করে। সুতরাং জাতীয়তাবাদ কোন ভূঁইফোর ধারণা নয়। এর উদ্ভব, বিকাশ ও বিনাশ রয়েছে।

কোহন (Kohn) জাতীয়তাবাদকে বলেছেন, "Sources of all creative cultural and economic well being."– সুতরাং বলা যায় যে জাতীয়তাবাদী চেতনা শুধু সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক নয়, বৈজ্ঞানিক- দার্শনিক, যন্ত্রকৌশল -পুরকৌশল অগ্রগতিরও ভিত্তি। কারণ জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ ঘটে স্বজাতির ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব বোধের মধ্যে।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিমন্ডলে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নানাভাবে দেয়া হচ্ছে: 'জাতীয়তাবাদ হচ্ছে জাতির আত্মোপলব্ধি', 'রেনেসার ফলশ্রুতি', 'সংস্কৃতি ভিত্তিক জনসত্তা', 'সকল অধিবাসীর একাত্মবোধ', Sentiment of oneness ইত্যাদি।

ল্যাটিন শব্দ ন্যাসসি (Nasci) বা জন্মগ্রহণ করা থেকে ইংরেজি Nation শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। বাংলা জাতি কথাটি ইংরেজি Nation শব্দের অর্থজ্ঞাপক। বেপড়ায় জাতি বলতে একই জায়গায় জন্মগ্রহণকারী একদল লোককে বোঝানো হতো। সে জায়গাটি আয়তনে ছোট হতে পারে। আবার বড়ও হতে পারে। মধ্যযুগের ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একই জায়গায় ছাত্রদের একটি জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। কালক্রমে জাতি কথাটির দু'টি অর্থই করা যায়। প্রথম অর্থটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, দ্বিতীয় অর্থটি অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিকাশ লাভ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী লেখকদের মতে একই দেশের ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকল মানুষ মিলে যে জনসমষ্টি সৃষ্টি হয় তারা হলো জাতি। বিপ্লবের সময় ফরাসীরা জমিদারদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষ ক্ষমতা বিলোপ করে দেয়। তারা তিনটি রাজ্যকে একটি ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির অধীনে নিয়ে আসে এবং রাজকীয় ক্ষমতার স্থলে আইনকে প্রতিস্থাপন করে। যারা সাংবিধানিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বিচ্ছিন্নতার বদলে ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার সমর্থক তারাই জাতিগত ধারণার ধ্বনি তোলে। জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য ছিল সমাজের আধুনিকীকরণ এবং প্রশাসনকে ন্যায়পরায়নতা ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করা। অতীতে জাতি বলতে যা-ই বুঝানো হয়ে থাকুক না কেন, আধুনিক যুগের প্রারম্ভ থেকে এসব বিপ্লবী ধারণা জাতীয়তাবাদীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। ইউরোপের সাবেক উপনিবেশ

এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদী ধারণার সঙ্গে আধুনিকতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার পেছনে ঐতিহাসিক কারণ জড়িত রয়েছে। যে যুগ আধনিকতা বিকাশের যুগ সে যুগে উপরোক্ত তিনটি মহাদেশের রাষ্ট্রগুলো ঔপনিবেশিকতার শিকার হয়েছিল। ফলে এসব দেশের পশ্চাৎপদ সমাজগুলোতে আধুনিক ব্যবস্থাবলী চালু হয়নি। যদি অল্প স্বল্প কিছু হয়েও থাকে সেটুকু হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসকদের নিজেদের স্বার্থ এবং খুবই সীমিত আকারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সে সকল দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও প্রচেষ্টার সঙ্গে আধুনিকতা যুক্ত হওয়াটা ছিল অনিবার্য।

প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগের শুরুতে জাতি শব্দটিকে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রাজনৈতিক প্রচারকরা কোন দেশে বা সে দেশের কোন অংশে জনগণের স্বাধীন ইচ্ছায় তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠিত হওয়ার মতের সমর্থকদের জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করতেন।

সরকার পদ্ধতি যে রকমই হোক না কেন আইন ও কূটনীতির ভাষায় একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রই হলো একটি জাতি। ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এর ফলে জাতি শব্দের রাজনৈতিক ও আইনগত যে দু'টি অর্থ ছিল সেগুলো মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার উদ্ভব, বিকাশ ও বাস্তবে তার প্রয়োগের পর থেকে রাজনৈতিক অর্থে সেটি জাতি আইনগত অর্থেও সেটি জাতিরূপে চিহ্নিত হচ্ছে। ইউরোপে জনসমর্থিত জাতীয় সরকার শুধু রাজারই নয় তার রাজ্যের অস্তিত্বও বিপদাপন্ন করে তোলে। রাজতন্ত্রের যুগের মানুষ পরিচিত হতো এককেটি রাজ্যের প্রজা হিসেবে। প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থা জনপ্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকলে কে কোন রাজ্যের প্রজা একথা অবান্তর হয়ে থাকে এবং যে কথা গুরুত্ব লাভ করে তা হলো কে কোন জাতির লোক। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদ্ভাবক ছিলেন মাৎসিনি। তিনি মনে করতেন এই মৌলিক বিষয়টির মিমাংসা হলে তখনকার ঝঞ্ঝা বিক্ষুদ্ধ ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হবে। মাৎসিনির বহু পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের ঘোষণার মধ্যে এই মতবাদেরই প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯১৯ সালে পূর্ব ইউরোপের সীমানা নির্ধারনের নীতি হিসেবে মাৎসিনি ও উইলসনের মতই প্রাধান্য পায়। কিন্তু ১৯৪১ সালে জার্মানীতে নাৎসীদের উপদ্রব ও রাশিয়ান বলশেভিকদের প্রতিষ্ঠার ফলে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। তখন জবরদস্তি করে জাতিগত ইস্যুগুলো চাপা দেয়া হয়। কয়েক বছর যেতে না

যেতেই আসল ইস্যুগুলো আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং ইউরোপের মানচিত্র আবার পাল্টে যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিলুপ্তি, জার্মানীর পুনরায় এক রাষ্ট্র গঠন এবং সমাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ইউরোপের মানচিত্রে আরেক দফা পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই পরিবর্তন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঘটনা।

জাতিসংঘ সনদে সরকার পদ্ধতি রাষ্ট্রের আয়তন ও আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেক দেশকে একটি জাতি বলা হয়েছে। ইউরোপের বাইরে কমিউনিস্টগণ জাতি বলতে এই ধারাই গ্রহণ করেছেন এবং তার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। কার্ল মার্কস জাতীয়তাবোধ প্রত্যাহার করেছেন এই যুক্তিতে যে, তাতে তাঁর উদ্দিষ্ট সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের বিকাশ ঘটবেনা। কিন্তু মার্কস জাতীয়তাবাদের আদর্শ বর্জন করলেও পরে এর অদম্য শক্তি দৃষ্টে অটোবাওয়ের ও লেলিন জাতীয়তার ধারণা সরাসরি প্রত্যখান করেননি।

তৎকালীন প্রেক্ষাপটে ভারতীয় উপমহাদেশে ১৮৮৫ সালে গঠিত ন্যাশনাল কংগ্রেস, ১৯২০ সালে গঠিত তুরস্কের ন্যাশনাল প্যাক্ট, ১৯২৯ সালে গঠিত মেক্সিকোর ন্যাশনাল রেভুলেশনারী পার্টি, এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকায় জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের বহি:প্রকাশ। অধুনা জাতিসংঘের ব্যাখ্যায় ও দলিল দস্তাবেজে জাতিসত্তার সংগে আধুনিকভাবে অবিচ্ছিন্ন বিষয় হিসেবে দেখানো হয়। জাতিসংঘের ভূমিকা সম্পর্কে আর যা-ই মত থাকুক না কেন আইনত: ও কার্যত: এটি একটি বিশ্বজনীন সংস্থা। সার্বভৌম জাতিসত্তার স্বীকৃতির ফলে চীনের মতো একটি বৃহৎ ও নেপালের মত একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য। এ ঘটনা দ্বারা জাতীয়তার যেটি রাজনৈতিক স্বার্থতার চাইতে বেশি প্রকাশ পায় আইনগত স্বার্থটি। যার অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্র জনগণের দ্বারা গৃহীত আদর্শ মোতাবেক শাসিত হবে এবং তার মধ্য দিয়ে জন স্টুয়ার্ট মিলের সংজ্ঞা মাফিক নেশনগুলো ন্যাশনালিটি হয়ে উঠবে এবং বড় ছোট নির্বিশেষে বিশ্বসভায় সকলে সমান মর্যাদা ভোগ করবে। অধ্যাপক জেডিবি মিলার বর্তমান বিশ্বকে আখ্যায়িত করেছেন দি ওয়ার্ল্ড অফ স্টেটস বা রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বারা গঠিত বিশ্বরূপে। এ কথার অর্থ হলো বর্তমান বিশ্ব রাষ্ট্র সমষ্টির দ্বারা গঠিত এবং রাষ্ট্ররাই রাজনৈতিক, আইনগত ও কূটনৈতিক অর্থে জাতি। জনগোষ্ঠীগুলোকে রক্ত সম্পর্ক ও মাতৃভাষার আলোকে বিচার করলে তারা বড় জোর রেইস হতে পারে, নেশন অবশ্যই নয়। একটি রেইস, কিংবা একাধিক রেইস যখন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রসত্তার মালিক তখন তারা আধুনিক অর্থে নেশন। যেমন বাংলাদশের বাঙালিরা ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠীগুলো বাংলাদেশী নেশন।

জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে E. H. Carr (ক) সর্বগ্রাহ্য সরকার, (খ) নির্দিষ্ট ভূখন্ড, (গ) জাতিগত স্বাতন্ত্র্য, (ঘ) সার্বজনীন আগ্রহ এবং (ঙ) সম্মিলিত ইচ্ছা ও অনুভূতির কথা উল্লেখ করেছেন।

পাশ্চাত্য মনীষীগণ জাতীয়তাবাদের মূলে যেসব 'সাবজেকটিভ' ও 'অবজেকটিভ' উপাদান সক্রিয় থাকে বলে উল্লেখ করেছেন– সেগুলো হ'ল একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রসীমায় বসবাসকারী জনগণের– "'common language, value systems, religion and literature, common economic and political creeds, common government, historical traditions, symbols and experiences, conflict and common enemies, the growth of communication system etc.'' এ সব উপাদান একটি রাষ্ট্রীয় জাতির রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদ নির্মাণে সহায়ক– তা'সত্য। কিন্তু প্রত্যেকটি জাতি– রাষ্ট্রেই উক্ত উপাদানসমূহ সমভাবে উপস্থিত থাকে না। বিশেষ করে একাধিক ভাষা, একাধিক ধর্ম, একাধিক জাতিসত্তা সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রে 'কমন ল্যাংগুয়েজ' খুব কম-ই আশা করা যায়। ফলে এই ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক জাতীয় রাষ্ট্রেও ভাষাগত নিপীড়নের প্রশ্ন আসে। সংখ্যাগুরুর ভাষা তখন সংখ্যালঘু এক বা একাধিক জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্যের অবদমনে নিয়োজিত হয়। যেমন ভারতে এখন হিন্দীর ভূমিকা। ফলে সুইডেনের মত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (যেখানে ৪টি ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে স্বীকৃত) না হ'লে, জাতীয়তাবাদ ভাষাগত ক্ষেত্রে উগ্র জাতীয়তাবাদে রূপ নিতে পারে।

একই ভাবে, একাধিক ধর্মগোষ্ঠী সমন্বিত রাষ্ট্রেও 'কমন রিলিজিয়ন' থাকা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রেও সংখ্যাগুরুর ধর্ম, গণতান্ত্রিক জাতীয় রাষ্ট্রে ধর্মগত নিপীড়নের ভূমিকা গ্রহণ করার প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। সংখ্যাগুরুর ধর্ম তখন এক বা একাধিক ধর্মীয় সংখ্যালঘুর উপর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নিপীড়নে নিয়োজিত হতে পারে। সাম্প্রদায়িকতা তখন সরকারী নীতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ভারতে হিন্দু ধর্ম।

অনুরূপভাবে একাধিক ভাষা, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভূখন্ড ও নানা ধর্ম সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় রাষ্ট্রে সাধারণ মূল্যবোধ, সাধারণ সাহিত্য-সংস্কৃতি, সাধারণ ঐতিহ্য, সাধারণ অভিজ্ঞতা, সংহতি এবং সাধারণ শত্রুও দেখা দিতে পারে না; ফলে, এসব ক্ষেত্রে সরকার ও জনগণ যদি রাষ্ট্র বন্ধনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দান না করে- তা হ'লে, জাতীয়তাবাদ বিঘ্নিত হয় এবং তার সদর্থক রূপের অনেকটাই বিলুপ্ত হয়। যেমন '৭১–পূর্ব-পাকিস্তান।

আর যদি একাধিক জাতিসত্তা সমন্বিত জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয় তা হ'লে সে রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসত্তার লোকের কিংবা যে জনসত্তা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে, একটি সুসংহত গণতান্ত্রিক জাতীয় চেতনা ও মূল্যবোধের অভাবে তারা, দূর্বল অন্যান্য জাতিসত্তার লোকদের ওপর বৃহৎ জাতিসূলভ জাতিগত (Racial) নিপীড়ন চালাতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ হয় বিপর্যস্ত এবং হীনবল। উদাহরণ– বর্তমানে শ্রীলংকা, পাকিস্তান।

যে কোন জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে 'জাতীয়তাবাদ' প্রত্যয়টির সঠিক অর্থানুধাবন এবং এর উপর সংক্ষিপ্ত তত্ত্বীয় আলোকপাত প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদ প্রত্যয়টির ব্যবহারে এত মাত্রা রয়েছে যে, একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় সবগুলো মাত্রাকে সন্নিবেশিত করা প্রায় অসম্ভব। এক কথায় জাতীয়তাবাদ কী– তার উত্তর দেয়া অত্যন্ত জটিল। তবে সকল জাতীয়তাবাদের মধ্যে দু'টো মাত্রার সম্পৃক্ততা অত্যাবশ্যক—এর একটি অর্থনৈতিক ও অপরটি রাজনৈতিক। জাতীয়তাবাদ প্রত্যয়টির সঠিক অর্থানুধাবন করতে হলে 'জাতি, 'জাতিত্ব' ও 'জাতীয়তাবোধ'– এ তিনটি শব্দের সঠিক অর্থ বিশ্লেষিত করতে হবে। আমরা সংক্ষেপে এর বিশ্লেষণ করছিঃ

জাতিঃ জাতি হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত সেই কর্পোরেট সোসাইটি বা জনগোষ্ঠী, যারা ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত সুনির্দিষ্ট টেরিটরি বা আবাসভূমির বাসিন্দা।

নেশন-স্টেটের অধিবাসী সেই লোক সমষ্টির সামগ্রিক বা সমষ্টিগত জীবন স্ব-নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ সেই জনসমষ্টি এরূপ একটি নিজস্ব সরকার দ্বারা শাসিত, যে সরকার সর্বক্ষেত্রে সত্যিকারার্থে স্বাধীন এবং কোন ক্ষেত্রেই অন্য কোন শক্তির লেজুড় বা তাবেদার নয়। জাতি প্রত্যয়টি সম্পূর্ণত নৃতাত্ত্বিক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন স্টুয়ার্ট মিল-এর মতে "এক সঙ্গে বসবাসকারী একদল লোক যদি পরষ্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং একে অন্যের কল্যাণ কামনা করে, তারা যদি স্বেচ্ছায় নিজেদের মধ্যে কারো জন্য এমন কিছু করে যা তারা অন্য কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির জন্য করে না, তারা নিজেদের লোক দ্বারা গঠিত সরকার কর্তৃক শাসিত হয় এবং স্বেচ্ছায় এই সরকারের অধীনে বাস করতে সম্মত হয় তবে তাদের নিয়ে গঠিত হয় একটি জাতি।"